গুরুপদ অধিকারী

সৌন্দর্যমগ্ন সাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদার

বাংলা সাহিত্যের এক অজ্ঞাত, অবহেলিত কথাসাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদার। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে অনেকে চিনলেও সমসাময়িক লেখকগোষ্ঠী তাঁকে নিয়ে তেমন আগ্রহ দেখাননি। এর পিছনে ছিল লেখকের ভাবপ্রবণতা ও দুরূহ রচনাশৈলী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রুক্ষ ও রুদ্র পরিবেশে জন্মেও তাঁর উপন্যাসে রূপকথা রোমান্সরস প্রধান হয়ে উঠেছে। গ্রামজীবনের মানুষকে তুলে ধরেছেন, কিন্তু মাঝে মাঝেই তিনি বস্তুলোক ছেড়ে নির্বস্তুক সৌন্দর্যের জগতে পাড়ি দিয়েছেন। এর ফলে কাহিনীতে সমন্বয়ের অভাব ঘটেছে। একথা লেখক নিজেও খুব ভালোভাবে জানতেন। 'নিম অন্নপূর্ণা' নামে ছোটোগল্প প্রকাশের পর সেজন্যই রসিকতা মেশানো আক্ষেপ ফুটে উঠেছিল তাঁর কণ্ঠস্বরে। "আমার বই ঊনত্রিশখানা বিক্রি হয়েছিল, তারপর তিরিশজনই দোকানে বই ফেরত দিয়ে গেছে।"[১] স্বল্প সংখ্যক পাঠক নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন কমলকুমার মজুমদার। এই পাঠকরা পুরোমাত্রায় অ্যাকাডেমিক পাঠক। কমলকুমারের ভূমিকা লিখতে গিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর রচনাসমগ্রের ভূমিকায় লিখেছেন, "একটি ছোট অথচ মনোযোগী পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করবেন বলেই যেন কমলকুমার তাঁর কাহিনীগুলিকে ভাষার বর্ম দিন দিন আরও সুদৃঢ় করেছেন।"[২]

সালটা ছিল ১৯৫৩। কলেজ পাশ তরুণদের নিয়ে তৈরি 'হরবোলা' নামের এক নাট্যদলের পরিচালক ছিলেন কমলকুমার মজুমদার। একই সঙ্গে এলগিন রোডে সিগনেট প্রেসের বাড়িতে জমে উঠেছিল সাহিত্যিক আড্ডা। দলে ছিলেন সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত, সত্যজিৎ রায়, সৈয়দ মুজতবা আলি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আবু সয়ীদ আয়ুব, নীহাররঞ্জন রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। সহজাত পরিহাসবোধ, বুদ্ধির চাতুর্য ও বাগবৈদগ্ধ্যে কমলকুমার ছিলেন অসাধারণ। এই সময়েই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরে আত্মপ্রকাশ করল 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা। কমলকুমারের টুকরো টুকরো রচনার সূত্রপাত ঘটল এই সময় থেকেই। যদিও সারাজীবনে খুব বেশি লেখালেখি তিনি করেননি। এই পর্বে মাত্র আটটি উপন্যাস আর কিছু গল্প লিখেছিলেন তিনি। তাঁর উপন্যাসগুলি হল : 'অন্তর্জলী যাত্রা', (১৩৬৯), 'গোলাপ সুন্দরী', 'অনিলা স্মরণে', 'শ্যাম-নৌকা', (১৩৭৮), 'সুহাসিনীর পমেটম', 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক', (১৩৫৮), 'খেলার প্রতিভা', 'শবরী মঙ্গল' (১৩৯১)

১৩৬৯ সালে বের হলো তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা'। অন্যদের থেকে তাঁর এই লেখার জাত ছিল পুরোপুরি আলাদা। সেকথা স্মরণ করেছেন সমসাময়িক সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "তাঁর প্রথম উপন্যাস দেখে আমরা স্তম্ভিত। এরকম বাংলা গদ্য আমাদের কিংবা বাংলা গদ্যের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক দূরে। গুরু-চন্ডালী শব্দ মেশাবার প্রক্রিয়া আর কারুর রচনায় নেই... এবং বাক্যবন্ধও অতি জটিল, বাংলা ব্যকরণের কোনো নিয়মের ধার ধারে না।...কমলকুমারের মুখের ভাষার সঙ্গে তার লিখিত বাক্যের হাজার

যোজন ব্যবধান। তাঁর মুখের ভাষা ছিল খাঁটি মধ্য কলকাতার, অনেক সময় যাকে আমরা বলি কাঁচা বাংলা, (অর্থাৎ অতিশয় পরিপক্ক) এবং সবসময় রঙ্গরস মিশ্রিত। অথচ তাঁর লিখিত গদ্যের একটি বাক্য বারবার না পড়ে অর্থ উদ্ধার করা যায় না। তৎক্ষণাৎ অর্থ বুঝতে না পারলেও তাঁর লেখা, অনেকটা কবিতার মতন বারবার পড়তে ইচ্ছে হয়, প্রতিটি শব্দের প্রতি এমনই মনোযোগ এবং ভিতরে এমনই জাদু।''[৩] সেই থেকে বাংলা সাহিত্যে তিনি হয়ে উঠেছেন 'লেখকের লেখক।'

'গোলাপ সুন্দরী'

আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছে কমলকুমারের দুটি উপন্যাস—একটি 'গোলাপ সুন্দরী', অন্যটি 'সুহাসিনীর পমেটম।' উপন্যাসদুটিতে এক সৌন্দর্যমগ্ন কবিসত্তার প্রতিফলন ঘটেছে। বস্তুতপক্ষে তাঁর উপন্যাসগুলির চরিত্র বর্ণনা, ভাষাশৈলী সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। প্রথম উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা'-র ঠিক পর পরেই 'গোলাপ সুন্দরী' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল 'এক্ষণ' পত্রিকায়। যার সম্পাদক ছিলেন নির্মাল্য আচার্য ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত এক অসুস্থ যুবক বিলাস 'গোলাপ সুন্দরী' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। কাহিনীর সূচনা হয়েছে এক স্যানাটোরিয়ামে। বিলাস সেই স্যানাটোরিয়ামে বন্দি। সে দুর্বল। তার দু'চোখে হরিণের চঞ্চলতা, কখনো কবির ভাবাবেগ। অর্ন্তমুখী (introvert) স্বভাবের এই যুবক নিজেকে সারা পৃথিবীর মধ্যে বড়ো একা বলে মনে করে। মাঝে মাঝেই সে রোমান্টিক ভাবালুতায় আবিষ্ট হয়। তার কথাবার্তায়, তার অনুভূতিতে আছে কাব্যিকতা। বিলাসের একাকিত্ব বোঝাতে লেখক স্বতন্ত্র উপমা প্রয়োগ করেছেন।

'কাংড়া কলমের 'অভিসারিকা' চিত্র দর্শনে মানুষের যেরূপ একা বোধ হয়,ধৈবতের গাম্ভীর্যের রাজ্যে যেরূপ একাকী বোধ করে, সেইরূপ এইক্ষেত্রে বিলাসকে পকেটস্থ এই খস্‌খস্ শব্দ-যাহা অন্ধকারকে নাম ধরিয়া ডাকে—বড় একা করিয়াছিল।'

বিলাসের মনে যেমন কবিতার অদৃশ্য ছত্র, তেমনি স্যানাটোরিয়ামের অন্য এক রোগী চেট্টির সংগ্রহে ছিল অজস্র ফরাসি এপিটাপ। এমনকি চেট্টি নিজেও এপিটাপ রচনায় দক্ষ ছিল। চেট্টির কবিকল্পনা, এপিটাপ রচনা, কবিতা আবৃত্তি যেন আবদ্ধ স্যানাটোরিয়ামের মধ্যে এক ঝলক বিশুদ্ধ বাতাস। চেট্টির সংসর্গে আসার পর থেকে স্যানাটোরিয়ামের অসুস্থ পরিবেশেও বিলাসের মন তাই পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এক অদৃশ্য টানে এই বালক যেন তাকে বারবার আকর্ষণ করেছিল। তাই স্যানাটোরিয়াম ছেড়ে যাবার সময় চেট্টির ফ্যাকাশে শূন্য মুখখানি তার দৃষ্টিপটে ভেসে উঠেছিল। কিন্তু বিলাসের এই কাল্পনিকতা সংসারজগতে গুরুত্ব পায়নি। তার দিদি ওমি বিলাসকে 'পাগল' বলে মনে করে।

হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে মিয়ানী মৌজার এক ছোটো বিলাতি কটেজে, এক স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিলাস দিন কাটায়। কটেজের গেটের দু'পাশে বগনভেলিয়ার কমলালেবু রঙের ফুলসমেত অজস্র বন্য লতা। আশেপাশে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তার ভাব জমে যায়। অবশিষ্ট

সময়ে গভীর নিঃসঙ্গতা বা একাকিত্ব তার জীবনকে ঘিরে রাখে। কখনও সে ডায়ারি লেখে,আবার কখনও সে চোখ ফেরায় বাগানের দিকে। কটেজের বাগানে অজস্র গোলাপ। প্রস্ফুটিত গোলাপের সৌন্দর্যে তার মন ব্যাকুল হয়। সেখানে এক বিস্ময়কর ঝরণা থাকা সত্ত্বেও সেই ঝরণার কথা সে ভাবেনি, কারণ ঝরণা নিত্য সৌন্দর্য গোলাপ অনিত্য। 'প্রথমে শুকায় ধীরে ঝরিয়া চুপ, ক্ষণেকেই কোথাও ফুটিয়া উঠে, সমক্ষে থাকিয়াও চির বিস্মৃত'। গোলাপখেতের পাশে দাঁড়িয়ে তার মনে হয়, "যেন সমস্ত ছেলেবেলা আমার এবার গোলাপ হয়ে ফুটে উঠেছে। নিজে যেখানে নিজের সব থেকে বড়ো সঙ্গী।" ঘুমের মধ্যেও এই অ্যাবস্ট্রাক্ট সৌন্দর্যের চেহারা সে খুঁজে পায়। এভাবেই এক আত্মমগ্ন কবিপ্রকৃতি বিলাসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

বিলাসের কাছে পৃথিবী যেন 'শ্যামমোহিনী মায়ায় সচেতন রূপ', এক অপরূপ বৈচিত্র্যে ভরপুর। নিজের ডায়ারির মাথায় সে লিখে রেখেছিল 'Art is too long, life is too short.' জীবন নয়, জীবনের থেকে শিল্পকে সে বড়ো চোখে দেখেছিল। তার নিজের জীবন ক্রমশ শুকিয়ে গেছে তবু সৌন্দর্যে বিভোর থেকেছে। বিলাসের দু'চোখে ভেসে বেড়ায় লিনলেনের ফুলকাটা নীল হলুদ বুদ্বুদ। এই সৌন্দর্যটুকু বিলাসের সম্বল। সে অসুস্থ। তার অনুভূতির কথা, সৌন্দর্যের কথা উঠে আসে ডায়ারির পাতায়। অসুস্থতা সে মেনে নিতে পারে না। হাসপাতালে চেট্টির মুখে এপিটাপ শুনে, ডাক্তার রঙ্গস্বামীর ঘরে, মোহিতের বন্দুকের মধ্যে, গোলাপের খেতে এই নানা রঙের, নানা রসের, নানা রূপের সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করেছে বিলাস। বন্দিত্ব সে পছন্দ করে না। ঝড়-জলের প্রতিবন্ধকতায় সে কষ্ট পায়। শত শতাব্দীর আনন্দের সন্ধানে তার যাযাবরী মন ঘর ছেড়ে ছুটে বাইরে বের হতে চায়। চন্দ্রমাধববাবুর কাছে সে নিজের এই দুঃখের কথা জানায়। অপরের সুখে সে সুখী, অপরের খুশিতেই তার আনন্দ।

বিলাতি কটেজে থাকার সময় আত্মমগ্ন বিলাস ভাবাবিষ্ট হয়। তার মনে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয় মূলত দুটি ঘটনায়। মিয়ানির লিলি কটেজের রোমান্টিক পরিবেশে মানিক চ্যাটার্জি নামে এক সুন্দরী রমণীর উপস্থিতি এবং দ্বিতীয়ত, দিশড়া মৌজার বাসিন্দা গেলক মিত্তিরের স্ত্রী-র মৃত্যু। সেন্ট স্কুলের স্কলার যুবতী মনিক চ্যাটার্জি মুগ্ধা নায়িকা। প্রেম ও সৌন্দর্যে তার হৃদয় ছিল পরিপূর্ণ। মনিক ভালোবেসেছিল গোলাপ। গোলাপখেতের পাশে মুগ্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল। অপরের ভালোবাসা বিলাসকে আকর্ষণ করত। মনিকের প্রতি আকর্ষণে ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়েছিল বিলাস। অন্ধকারে মনিকের শরীর স্পর্শ করেছিল বিলাস। মনিকের শরীর জুড়ে ভাস্করের অপরূপ কারুকার্য। সে 'গোলাপসুন্দরী।'

গোলক মিত্তিরের স্ত্রী মারা গিয়েছিল যক্ষ্মায়। বিলাস নিজেও ছিল যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় মন্ত্রপাঠ করেছিল বিলাস। একদিকে সৌন্দর্য মাধুর্যে ভরা জীবন, অন্যদিকে মৃত্যুর কুটিলতা। গোলাপের সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ হয়। গোলাপের মধ্যে আছে আরোগ্যের স্পর্শ। 'Rose is a cure' যক্ষ্মাক্রান্ত বিলাসকে আচ্ছন্ন করেছিল মৃত্যুবোধ।

কাহিনীর শেষে গোলাপ সুন্দরী মনিকের মৃত্যু ঘটেছিল। একটি পুত্রসন্তান রেখে সে মারা গিয়েছিল। অসুস্থ বিলাস স্যানাটোরিয়ামের বেডে টাইপ করা চিঠিতে মনিকের মৃত্যু সংবাদ

পেয়েছিল। কোনো একসময় মনিকের মুখে তার মা পাগল ছিলেন জানতে পেরে বিলাস দু'চোখে দেখেছিল মহাপ্রলয়। আজ মনিকের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বিলাসের আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করেনি। মনে হয় এ নিছক এক প্রচলিত রোমান্টিক উপন্যাসের আবহ।

এই উপন্যাসে তৎসমগন্ধী ক্রিয়াপদ, শব্দবিন্যাস ও দীর্ঘ বাক্যপ্রয়োগের পাশাপাশি উপন্যাসে একেবারে সাধারণ কথ্য সংলাপ প্রয়োগ করেছেন লেখক। উপন্যাস জুড়ে রয়েছে বেশ কিছু দুর্লভ উপমার ব্যবহার। স্যানাটোরিয়ামে করিডোরে সাদা দেওয়ালকে মনে হয়েছে রমণীর চোখের পলকের মতো। বিলাসের দাঁড়িয়ে থাকা প্রসঙ্গে 'সাঁওতাল রমণীরা যেরূপ হাটে আসিয়া আপনার বিক্রয়ার্থে ঠেকাপূর্ণ সামগ্রীর সম্মুখে, মুখে একটি হাত দিয়া নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে সেইরূপ দণ্ডায়মান।' বিলাসের চোখের সৌন্দর্য রাধিকার মতো, চেট্টির এপিটাপে বাঘের গন্ধের উপমা প্রযুক্ত হয়েছে।

'সুহাসিনীর পমেটম'

'সুহাসিনীর পমেটম' উপন্যাসটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। 'পমেটম' শব্দের অর্থ সাজবার সুগন্ধী দ্রব্য। শব্দটি ইংরাজি 'pomatum' শব্দ থেকে উদ্ভুত হয়েছে। গোটা উপন্যাসে নানাভাবে চরিত্রের ভেতর দিয়ে লেখক সৌন্দর্যের অনুধাবন করেছেন। উপন্যাসটির শেষে যোহন একাদশীর হাত থেকে পলায়মান পাখির গগনবিহারী স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে সৌন্দর্যের পরিণত রূপ। উপন্যাসটির বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সৌন্দর্যের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হবে।

কাহিনীর মধ্যে ফুটে উঠেছে পরাধীন ভারতের ছবি। ইংরেজদের স্ফূর্ত্তির গাড়ি রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যায়। গাড়ির মধ্যে থাকা মদ্যপ অর্ধনগ্ন নারী-পুরুষ বিকট উল্লাস করতে করতে এগোতে থাকে। সামনে থাকা জনতা তাদের কল্লোল শুনে পথ ছেড়ে দেয়। ঔপনিবেশিকতা বা পরাধীনতাকে লেখক এই উপন্যাসে কোনো পৃথক বড়ো করে তুলতে চাননি। এখানে আঞ্চলিকতা বা গ্রাম্যতাই প্রধান। উপন্যাসের মধ্যে দেশি সংস্কৃতি ও মানুষের কথা গুরুত্ব পেয়েছে। একই সঙ্গে সৌন্দর্য অন্বেষণ এই উপন্যাসে পৃথক গুরুত্ব পেয়েছে।

· উপন্যাসে মুখ্যত তিনটি চরিত্র : পত্নী পরিত্যক্ত বৃদ্ধ যোহন একাদশী, পিতৃ পরিত্যক্ত বালক লখাই এবং পতি পরিত্যক্তা সুহাসিনী, ওরফে সুহা। প্রত্যেকেই মুক্ত, প্রত্যেকেই স্বাধীন। এছাড়াও আছে একাধিক চরিত্র। যারা মূলত গ্রাম্য ও স্থূল রুচিসম্পন্ন। যোহন একাদশী খৃষ্টান। সে পোস্ট অফিসে পিওনের কাজ করে। ভেতরের শূন্যতা থেকে সে অপরের চিঠি খুলে পড়ে, মাতাল আনন্দে মুক্তি খুঁজে বেড়ায়। গভীর সৌন্দর্যবোধ তাকে বারবার উদাস করে তোলে। বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াতে তার মন চায় না। সংসারী হওয়ার জন্যে তার আচরণ ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে।

গল্পের প্রেক্ষাপট চব্বিশ পরগণা। মেদিনীপুর থেকে লখাইয়ের মা গালচমকি (আসল না নয়) চব্বিশ পরগণায় কামিনরূপে একদিন ধান কাটতে এসেছিল। চব্বিশ পরগণাতেই তার

জন্ম হয়। বালক লখাইয়ের জন্ম এক অজ্ঞাতনামা ব্রাহ্মণের ঔরসে। এজন্য বারবার তাকে সমাজের কটূক্তি শুনতে হয়। তার আচরণে আছে ছেলেমি। কখনও সে বুড়ো আঙুল চোষে, আবার কখনও সে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কোনো বন্ধন সে পছন্দ করে না, মুক্ত জীবনের আশায় সে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে সে বিড়ি খায়। যদিও সে ঠিক নেশাখোর নয়। তার মা এক সাধারণ কামিন মাত্র। সে কুৎসিত দর্শনা। তার মুখ বাঁকা, গাল চমকায়। সে কারণে 'গালচমকি' রূপেই সে পরিচিতা। মায়ের কুৎসিত রূপের কারণে লখাই ব্যথা পায়, মনে মনে ঈশ্বরের ওপর বীতশ্রদ্ধ। সমাজ তাকে নানাভাবে তাচ্ছিল্য করে। ভেতরের কষ্ট তাকে ঘরছাড়া করেছে।

সুহাসিনী ওরফে সুহা এক পতিপরিত্যক্তা বালিকা। তার বাবা অক্ষয় মাস্টার। গ্রামের পোস্ট অফিসে কাজ করে। সে ব্রাহ্মণকন্যা। বিবাহিতা। তার স্বামী লেখাপড়া করে। তার বাবা পণের টাকা পরিশোধ না করায় সে বাপের বাড়িতেই থাকে। বাস্তবিক সে সুন্দরী। সে অল্পবয়সী। তার দেহ সুঠাম। সে চঞ্চলা। ফল চুরির জন্য আঁকশি লগি নিয়ে সে প্রায়ই পশ্চিমপাড়ায় যায়। অপহরণে সে দক্ষ এবং এই কাজে তার সঙ্গী লখাই। প্রকৃতপক্ষে সে এক গেছো স্বভাবের মেয়ে। শিবমন্দিরের রূপসী কন্যা বিধবা কামিনী তার স্বভাবের জন্য তাকে সর্তক করে । বিধবার এই কুণ্ঠিত জীবন সুহা মোটেই মেনে নিতে পারে না। তার সঙ্গে খেলা করে লখাই। সে দেবদেবতা মানে। রথের মেলায় সে ঈশ্বরের কাছ থেকে মোক্ষলাভ করতে চেয়েছিল। যদিও তা তার একান্ত নিজের প্রার্থনা নয়, তার বাবার শিখিয়ে দেওয়া কথা। লখাইকে সে ভালোবাসত। লখাইয়ের প্রতি রূঢ় আচরণ করায় সুহা বৃদ্ধ যোহনের উদ্দেশ্যে নুড়ি ছুঁড়েছে, তার বাবাকে উচ্চগ্রামে ধমক দিয়েছে।

সুহা বিবাহিত। সুহাদের বাড়িতেই পোস্ট অফিস। সুহা অফিসে গিয়ে জোড়া পোস্টকার্ড বেচে এক পয়সা বেশি নেয়। অপরের চিঠি খুলে দেখে। অফিস ঘরে শিস দেয়। সে কিছুটা বেপরোয়া প্রকৃতির। বাপের বাড়িতে থাকার সময় মাথায় ঘোমটা দিয়ে থাকা সে মোটেও পছন্দ করে না। মেয়ের এই স্বাধীন প্রকৃতি অক্ষয় খুব একটা পছন্দ করে না। অক্ষয়ের মুখের ভাষা এমনিতেই শিষ্ট নয়। কোনোভাবেই বরপণের টাকা দিতে সে নারাজ। বাবার সঙ্গে মেয়ের মাঝে মাঝেই অশান্তি লেগে থাকে। বিশেষত, মেয়ের সৌন্দর্য নিয়ে বাবা ছিল বেশ কিছুটা চিন্তিত। যোহনের সঙ্গে একান্ত আলোচনায় সে জানায়, ' সৌন্দর্য একটা, বুঝলে যোহন অভিশাপ।'

সুহা সৌন্দর্য অন্বেষণ করে বেড়ায়। লখাইয়ের মুখে নিজের রূপের প্রশংসা শুনে সে শকুন্তলার ছবির সামনে এসে দাঁড়ায়। সেই ছবির সঙ্গে নিজের রূপের তুলনা করে। কখনো বা বিধবা কামিনীর থেকেও নিজের রূপের প্রশংসা শোনার জন্য লখাইয়ের কাছে হাজির হয়। আকাশে মেঘের সৌন্দর্যে সে আবিষ্ট হয়। বকের সৌন্দর্য তাকেও হতবাক করে। সুহা জানে, ঠাকুর দেবতার মধ্যে সুন্দরের অবস্থান। তুকতাক, মন্তরের মধ্যে দিয়ে তাকে পাওয়া যায় না, তাই শৈবালীর তুকে ঠাকুর দেখা দিতে পারে না, সে নিতান্ত ছোটো জাতের বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্রাহ্মণের 'চাল কলা বাঁধা' সে পছন্দ করে না।

লখাই খুব রুগ্ন এক মাতৃবৎসল বালক। সুহার অপরিসীম সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ। মায়ের কুরূপ দেখে সে ব্যথিত। সুহা তার আশ্রয়, তার কাছে সে গান শুনতে, গল্প করতে আসে। সুহার বিছানায় ওঠে। সুহার গান শুনতে শুনতে বালকোচিত আবেগের বশে সুহাকে এসে সে জড়িয়ে ধরে। সমাজ সংসার তাকে খুব একটা ভালো চোখে দেখেনি। লখাইকে দিয়ে দুর্বা তোলানো মেনে নেয়নি দুর্লভ ময়রার কাকী। এই ভ্রষ্টা নারীর কথা অবশ্য সুহা কানে নেয়নি। সুহা সমাজকে ভয় পায় না। লখাই মিথ্যাবাদী। সুহার বাবা অক্ষয় মাস্টার (পোস্টমাস্টার), পিওন যোহন একাদশী তার স্বভাবের জন্য তাকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালি দিয়েছিল। বালকের মুখের ভাষা কখনো-কখনো শালীনতার মাত্রা লঙঘন করেছে। লখাইয়ের মধ্যে ভক্তির বড়ো অভাব। রথের মেলায় সুহার বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও সে প্রণাম করেনি। গোপালকে সঙ্গী করে দুর্লভ ময়রার কাকীর চন্দন কাঠ চুরি করেছিল লখাই। সে চঞ্চল, খেয়ালি। তার বড়ো গুণ সে এক সৌন্দর্যমুগ্ধ বালক। পঞ্চাননের মেলা, রথের মেলায় নানাপ্রকৃতির মানুষকে দেখে তাদের ভেতর থেকে এক অপরূপ সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করেছে লখাই। সুহার অসীম সৌন্দর্য সম্পর্কে তার ধারণা সুহা ম্যাজিক জানে।

কামিনীর স্বামী হরিহরের প্রতি ইংরেজদের অত্যাচারের প্রসঙ্গ শুনে লখাইয়ের মনে তীব্র হয়ে উঠেছিল ইংরেজ বিদ্বেষ। তার মা, সুহা বা কামিনী, এদের বিড়ম্বিত জীবন অস্থির করে তুলেছিল লখাইকে। এর প্রধান কারণ :

এক : তার মায়ের প্রতি সামাজিক বঞ্চনা এবং মায়ের শ্রীহীনতা।

দুই : সুন্দরী সুহাকে শ্বশুরগৃহ কর্তৃক পরিত্যাগ করা।

তিন : কামিনীর স্বামীর প্রতি ইংরেজদের অত্যাচার এবং কামিনীর রূপের প্রতি বঞ্চনা।

সবকিছুর জন্য সে ঈশ্বরকে দায়ী করে। হয়তো ঈশ্বরের প্রতি এজন্যই সে নির্দয়। দেব দৈবে কোনো ভক্তিশ্রদ্ধা তার মধ্যে দেখা যায় না। বস্তুত পক্ষে লখাই এক রূপমুগ্ধ বালক। তার রোমান্টিক মন সেই রূপের অন্বেষণে ব্রতী হয়েছে।

লখাই এক সৌন্দর্যবিলাসী বালক। ঘুমের ঘোরে সে এই সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করে। তার উপলব্ধিতে সর্ব্বাণী পাঠকের মেয়ে এত সুন্দর যে সে 'আলো দিয়ে তৈরী,...আলো শুধু আলো।' বাল্যের চপলতা, অস্থিরতা, কল্পনা তাকে প্রতিমূহূর্তে অন্য জগতের অভিসারী করে তোলে। তার চিন্তা বা কল্পনার মধ্যে আছে অভিনবত্ব। "অন্ধতা উহার ভালো লাগে, কেন না অন্ধরা দেখিতে পায় না—কিন্তু অন্ধরা কাঁদে, তাহাদের চোখে জল পড়ে।" আর তখনি অন্ধ হয়ে মায়ের হাত ধরে ভিক্ষা করতে মন ব্যাকুল হয়। শিশুসুলভ কোমলতা, দয়া, ভালোবাসা তাকে অধীর করে তোলে।

কাহিনীর তৃতীয় চরিত্র যোহন একাদশী। ধর্মের দিক থেকে সে খৃস্টান। সে বৃদ্ধা। তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে পালিয়েছিল। একটা ব্যথা বা যন্ত্রণা তাকে চেপে ধরেছে। এর থেকে মুক্তি পাবার জন্যে কিছুটা আপনমনে সে গান করে। মদ খায়। তার উদাত্ত কণ্ঠের গান শুনে তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে অক্ষয়। বিশেষত অক্ষয় গোঁড়া হিন্দু। সে খৃষ্টানি মেনে নিতে পারে না।

যোহন একাদশী বয়স্ক হলেও তার অন্তরে একটি শিশু হৃদয় লুকিয়ে ছিল। বালক লখাই ছিল তার বন্ধুর মতো। লখাইয়ের কাছে সে নিজের মনের ভাব অকপটে ব্যক্ত করত। তার মনটাও ছিল লখাইয়ের মতো অত্যন্ত কোমল, অত্যন্ত দয়ালু। সেও ছিল সৌন্দর্যরসিক। নিজেকে সে সর্বদা সুন্দর বলে ভাবত। 'আমি নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও সুন্দর'।

যোহন একাদশীর কথাবার্তা শুনে বালকও পুলকিত হয়। সে খ্যাপা বাউণ্ডুলে। আরাধ্য প্রভু যিশুকেও সে সুন্দর বলে মনে করে। মাতাল হরিয়া পাশি সৌন্দর্যবোধের ব্যাপারে যোহনের অক্ষমতা প্রকাশ করলে সে খেপে লাল হয়ে যায়। হরিয়া পাশি বাস্তববাদী। নীচ জাতির মাতাল হলেও ভাবের কথা সে সহজভাবে ব্যাখ্যা করে। সে মনে করে, বস্তুত এটা নিছক ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ আমাদের সৌন্দর্য উপভোগের মধ্যে যৌনতা মিশে থাকে। সে আরও মনে করে, রমণীরা আঠারোর মধ্যেই প্রকৃত সৌন্দর্যের ঝলক। হরিয়া পাশি জানায়, ''আমরা জাতশকুনি যতই উঁচুতে উঠি ভাগাড়ের দিকে নজর।'' ক্ষুব্ধ যোহন হরিয়ার কথায় সায় দিতে পারে না। তাই সরাসরি আক্রমণ করে হরিয়াকে। হরিয়া বলে, '' সৌন্দর্যের স্মৃতি নাই কাজেই বিস্মৃতি নাই''। এই সুন্দরের স্পর্শ পেতে হলে মনকে শক্ত করতে হবে, এজন্য আগে মনকে বশীভূত করতে হয়। উপন্যাসের মধ্যে এভাবেই গভীর তত্ত্বকথা অতি সহজভাবে উঠে এসেছে। যোহনের কথার মধ্যে দিয়ে মানবপ্রকৃতির স্থূল স্বভাব তুলে ধরেছেন লেখক। অভ্যাসকেই মানুষ সত্য বলে বিশ্বাস করে। নিরাবয়ব অ্যাবস্ট্র্যাক্টকে মানুষ মনস্বিতা বলে মনে করে। হরিয়ার বাস্তবমুখী ভাবনাচিন্তা যোহন মোটেও পছন্দ করে না।

একটা পাখি নিয়ে যোহন সর্বদা ঘুরে বেড়ায়। মনে হয়, চিত্তকে পাখির রূপকে হাজির করতে চেয়েছেন লেখক। চিত্ত চঞ্চল, তা অলীক মায়ামাত্র। পাখিও সুন্দর, সে বন্দিত্ব চায় না, সে বন্ধন চায় না। বাক্যনির্মাণ সে পছন্দ করে না। আলোর পৃথিবীজুড়ে সে শুধু খেলতে ভালোবাসে। রামায়ণের সীতাও যোহনের কাছে মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সুন্দরের সন্ধান পেতে পাখি নিয়ে যোহন জলভরা মাঠের মধ্যে আলপথে নেমেছে। সঙ্গে নিয়েছে বালক লখাইকে।

স্ত্রী-র পলায়নের পর থেকে যোহনের মন হয়ে উঠেছে অশান্ত। সদ্য কেনা হাঁড়ি সে ভেঙে ফেলেছে। মনের অশান্তির জ্বালায় সে মদ ধরেছে। হিন্দুধর্মের প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করেছে মনে মনে। পুত্রসন্তানের জন্য সে ব্যাকুল হয়েছে। লখাইয়ের মাধ্যমে সে পেতে চেয়েছে অচরিতার্থ পিতৃত্বের স্বাদ। বারবার লখাইকে সে 'বাবা' বলে ডাকার জন্য মিনতি করেছে। ভেতরের অব্যক্ত যন্ত্রণায় সে বিমূঢ় হয়েছে। কখনো বা বিয়ে করার জন্য সে ঝুঁকেছে। অনেকেই তাকে নিয়ে খ্যাপায়। সামান্যতম কথাবার্তাতেও তিতিবিরক্ত হয়ে পড়ে সে। যোহন অপরের চিঠি পড়ে ছিঁড়ে ফেলে। চিঠি পড়তে পড়তে নিজের অবস্থার কথা সে ভাবে, ''তুমি যখন প্রথম এসেছিলে...সবাই হেসেছিল' 'কিংবা 'তুমি যখন কেঁদেছিলে...সবাই হেসেছিল''। এক চরম ট্র্যাজেডির নিষ্ঠুরতা তাকে গ্রাস করে। সে মাতাল। কৃতকর্মের জন্য পাপবোধ তাকে তাড়া করে বেড়ায়। কখনও সে স্থির থাকতে পারে না। রথের মেলায় লখাই ও সুহার থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়েছে। সে জানিয়েছে, "ঐ যে ঐখানে সাঁকো...সাঁকো থেকে আমার পাপটা ফেলে দিয়েছি।" পাপ বিসর্জন দিয়ে নিজের আত্মাকে সে জুঁইফুলের মতো পবিত্র করতে চেয়েছে।

চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে গ্রাম্য সংস্কৃতির স্থূল চেহারা তুলে ধরেছেন লেখক। শৈবলিনীর মতো রমণীরা তুকতাক, বশীকরণ বিদ্যায় পটু। সে গ্রাম বাংলার কপালকুণ্ডলা। চন্দনকাঠ চোর ধরতে সে চালপড়া খাওয়ায়। গ্রামের মানুষ বাণমারায় বিশ্বাস করে। লখাইও জানে ভাত নাচালে লক্ষ্মী পালায়। তারা মা মনসার প্রতি ভক্ত, পঞ্চাননের প্রতি ভক্ত। 'পঞ্চানন' অর্থে দক্ষিণ রায়। মঙ্গলবারে পঞ্চানন তলা সেজে ওঠে। প্রচুর লোক সেখানে জড়ো হয়। কেননা, সেখানে অনার্য দেবতা দক্ষিণ রায়ের অধিষ্ঠান। দক্ষিণবঙ্গে সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকার চেহারা এখানে উঠে এসেছে। একশো আট এয়োর লাল পেড়ে শাড়ির আঁচলকাটা সংগ্রহ করে লখাই বট-বিল্ব জোড়গাছের নীচে পঞ্চানন তলায় আসে। কুলটা বলে দুর্নাম থাকলেও এখানে শৈবালীর ভর হয়। ঢাকের আওয়াজ, নৃত্যগীত সহযোগে চারদিক জুড়ে চলে ঘোর ব্যস্ততা। বালক লখাই পর্যন্ত পঞ্চানন তলায় যোহন একাদশীর বিরুদ্ধে নালিশ করতে উদ্যত হয়েছে। গ্রাম্য মানুষের ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার প্রবণতা উপন্যাসে উঠে এসেছে। খবর শুনে বৃদ্ধ যোহন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে লখাইয়ের প্রতি। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সে জানিয়েছে, "আমার স্যাঁট করবে শৈবালী...আমি বলে হর রোববারে গীজ্জে যাই...।"

গ্রামটি অসাম্প্রদায়িক। গ্রামে নানাধর্মের প্রসঙ্গ এখানে স্থান পেয়েছে। হিন্দুধর্মের পাশাপাশি ইসলাম ধর্ম, খৃষ্টান ধর্মের সঙ্গে কাহিনীর মধ্যে উঠে এসেছে। যদিও খৃষ্টানদের প্রতি বিরূপতা প্রকাশ পেয়েছে। গ্রামের পড়শিদের মধ্যে লেখাপড়া বা শিক্ষাদীক্ষার তেমন প্রচলন নেই। অধিবাসীদের মধ্যেও লঘু গুরু জ্ঞান নেই, বালক লখাইকে মারতে উদ্যত হয় বৃদ্ধ যোহন। আবার সুহাসিনী বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে নুড়ি ছোঁড়ে। জাতধর্ম নিয়ে পরস্পর কথা চালাচালি হয়, খৃষ্টানকে কেউ সহ্য করতে পারে না। একসময় গ্রামে কলেরার প্রার্দুভাব ঘটে। মেলাতলার খাবার না খাওয়ার জন্য নিষেধ করতে দৌড়ে আসে স্কাউটদের দলবল।

লখাই সুহার আশ্রয়। তাকে ঘিরেই সে নিজের মনের কথা বলে। সুহা দরিদ্র। পরনের কাপড়টি তার শতচ্ছিন্ন। তাতে লজ্জা নিবারণ অসম্ভব। বার বার কাপড়টিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরে। তবু তার মনের মধ্যে কোথাও এতটুকু বিরক্তিবোধ নেই। এমনকি নিজের কৃতকর্মের জন্য নিজের কপালকে সে বিন্দুমাত্র দোষ দেয় না। তার বর পড়াশোনা করে। এজন্য স্বামীর থেকে সে দূরে থাকে।

কাহিনীর মধ্যে মৃত্যুর চেহারা বা বিভীষিকা লেখক হাজির করেছেন। সৌন্দর্য সেখানে মূল্যহীন হয়ে গেছে। কলেরায় অনেক লোক মারা গেছে। রাস্তার ধারে স্তূপীকৃত হয়েছে নরনারীর বিচ্ছিন্ন লাশ। জীবিত মানুষের সুন্দরের আরাধনার পাশে মৃত মানুষের নশ্বর দেহের সারাৎসার লেখক চিত্রিত করেছেন। সুহা নিজেকে আরও সুন্দর করে তুলতে চেয়েছে। সে পমেটম কিনেছে। পমেটম মেখে সুন্দর হয়েছে সুহা। কাহিনীর অন্তিমে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে সুহার। তার স্বামী তাকে জানিয়েছে, "ভাবছি পমেটম স্নো মেখে...সুন্দর দেখিয়ে লাভ... সুন্দরের ত এই দশা।" মৃত্যু ও জীবনকে এভাবেই লেখক পাশাপাশি হাজির করেছেন।

লখাইয়ের মন বড়ো সরল। কাঠবেড়ালির ত্বরিত গতিবিধি, টিয়ার কর্কশ ডাক, থানার ভৈর দফাদারের বাহারে সাইকেল, হ্যাণ্ডেলের চরকি তার মন কেড়ে নেয়। তবে বালকোচিত চাপল্য সত্ত্বেও সে সাহসী, চুরিবিদ্যায় দক্ষ। ভৈর দফাদারের ভীম হুঙ্কারকেও সে ভয় পায় না। বরং হাতের মুদ্রায় সে বোঝাতে চায়, "তুমি আমার ঘণ্টা করবে ভৈর দফাদার...আমি শালা চুরি করে বাড়ী ফাঁকা করে দেব... আমাকে ধরবে তুমি।" সে চুরি করে। মাঠে মাঠে সে গোবর কুড়ায়, মায়ের সঙ্গে মাঠে শাক তোলে। সে স্বাধীনচেতা, মুক্ত বালক। যোহন তাকে বাবা বলতে বলায় রেগে গিয়ে উদ্ধতস্বরে যোহনকে সে জানায়, "শালা খ্রেশ্চান ডিসকে পিরীচ বলিস, আলুভাতেকে আলুভত্তা বলিস্-তোদের জাত জন্ম আছে—? দাঁড়াও শালা পোষটো বাকসয় (Post Box) আমি সাপ পুরে দেব।"

লখাইয়ের মধ্যে সৌন্দর্যপ্রিয়, রূপকথা মেশানো এক শিশু হৃদয়ের স্বাভাবিক নমনীয়তাও লুকানো ছিল। গাছপালা বা প্রকৃতির শোভা দেখে সে সম্মোহিত হয়ে পড়ে। জীবনের সকল দুঃখ নিয়ে বেঁচে থাকা আল্লারখাকে সে দ্যাখে। আলা মাঠে মাঠে গোরু চরায়। তার বাবা মারা গেছে। তার মা-কে নিকা করেছে কাদের মিঞা। তার সৎ মা তাদের হেনস্থা করে। জীবনে আনন্দ কী তা আলা জানে না। কোনোদিন সে খেলা করেনি, আকাশের দিকে মুখ করে সে হাঁটতে থাকে। তার ম্লান মুখ, তীক্ষ্ণ নাক, ডাগর চোখ। সমস্ত ব্যাধি ও বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তার হাতে আছে একটি মন্ত্রপূত তাবিজ। আলা তাকে আবিষ্ট করে। সমস্ত ব্যাপারে তার অব্যক্ত কৌতূহল। সে কলকে হাতে পেয়ে আড়ালে ছিলিম টানে। ব্রাহ্মণের ঔরসে তার জন্ম। মনে মনে একটা ব্যথা, অভিমান তাকে সর্বদা কষ্ট দেয়। যদিও সে নিজে জানে না, ব্রাহ্মণের ঔরসে বলতে কী বোঝায়। সে না জানলেও আলা এ কথার অর্থ জানে, এমনকি সুহা বা বড়োদের কাছে জানতে ভয় পায়। লখাইয়ের নিজেকে মনে হয় সে অন্যদের থেকে আলাদা। যেখানে কেউ তার সমব্যথী নয়, কেউ তার আপনার নয়। শিশুহৃদয়ের এই অব্যক্ত বেদনা চরিত্রটিকে এক অন্য মাত্রা দান করেছে।

লখাই চির ঘরছাড়া। কখনও পঞ্চাননের মেলায় শৈবালীর ভর দেখতে ভিড় করে, কখনও সুহার হাত ধরে যায় রথের মেলায়। আবার কখনও সে আতরদাসী চ্যালেঞ্জ শীল্ডের ফাইনাল খেলা দেখতে যায়। যোহন একাদশী তার জন্মসূত্র নিয়ে গালি পাড়লেও যোহনের দুঃখে সে কাতর। সে তার শ্রদ্ধার পাত্র, নরজগতের সর্ব্বপ্রথম হিরো তথা নায়ক। লখাইয়ের কোনো পিতৃপরিচিতি নেই। যোহন জানিয়েছে, "তুই আমাকে বাবা বলবি কেমন।" তাকে 'বাবা' না বলার জন্য ভয় দেখিয়েছে যোহন। জানিয়েছে তার কৃতকর্মের জন্য সে তাকে থানায় দেবে। কাহিনীর শেষে সুহাসিনীর পমেটম চুরি করেছে লখাই। সে চুরি করেছে তার মায়ের জন্য। সুহার পাশে থাকলেও সে মনে মনে তার মা-কে ভালবাসত সবথেকে বেশি। আর সেকারণেই মায়ের দুঃখ কষ্ট ঘুচিয়ে মা-কে আরও সুন্দর করে পেতে চেয়েছে সে। তাই মা-কে জানিয়েছে "তুই সুন্দর হবি-দারুণ সুন্দর"। সে আরও জানিয়েছে, "যে শালা তোকে এমন করেছে—দেখুক সে শালা।" মায়ের এই যন্ত্রণা বালক লখাইকে অস্থির করেছিল। কুরূপা মা-কে সে সুশ্রী করে দেখতে চেয়েছিল।

উপন্যাসে একটা দ্বন্দ্ব আছে। সময়ের দ্বন্দ্ব। রাজরোষের প্রসঙ্গ আছে, আছে দ্বীপান্তরের প্রসঙ্গ। কিন্তু তাও খুব আলগোছে। লেখক এসবের গভীরে প্রবেশ করেন নি। অথচ এসবের মধ্যে দিয়ে কাহিনীকে আরও উচ্চ মাত্রা দেওয়ার অবকাশ ছিল। ইচ্ছাকৃতভাবে লেখক এসবের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখেছেন। গ্রাম্য মানুষের দেশজ সংস্কৃতির উপন্যাসের পরিচ্ছদ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। শিবমন্দিরের রূপসী কন্যা কামিনীর বয়স আঠারো। তার কথাবার্তা নবনীকোমল শান্ত, মৃদু, মুখ অপরূপ নমনীয়। কামিনীর স্বামী হরিহর ছিল স্বদেশি। দেশকে ভালবাসার দায়ে ইংরেজদের হাতে সে ধরা পড়েছিল। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সে শহিদ হয়েছিল। আজ বিধবা কামিনীর চুল অতি ছোটো করে ছাঁটা। সে দেবসেবায় নিরত। যোগিনীর মতো শান্ত, সংযত। এসবকে মানুষ মেনে নিয়েছিল। নিজেদের নিয়েই তারা মগ্ন ছিল। তাই কমলকুমারের উল্লিখিত উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ নেই। অশিক্ষা-অনাচারই সেখানে মুখ্য স্থান নিয়েছে। আঞ্চলিকতা, লোকাচার, অন্ধবিশ্বাস নানাভাবে উঠে এসেছে। মদন কবিরাজের স্ত্রী সন্তান মারা যাওয়ার পর হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মাটিতে পোঁতা সন্তানদের উদ্দেশ্যে দুগ্ধসিঞ্চন করত। তুকতাক জড়িবুটিতে অভ্যস্ত শৈবালী। উলঙ্গ হয়ে সে ঘুরে বেড়ায়।

নারী স্বাধীনতার ভয়ংকর বেলেল্লাপনা রূপ ফুটে উঠেছে ডাক্তার বুড়ো কাঙালীচরণের তৃতীয় পক্ষের সতেরো বছরের স্ত্রী ঊষার আচরণে। সুহার আচরণে স্বাধীন নারীসত্তার প্রকাশ ঘটেছে ঠিকই, তবে সেখানে উগ্রতা মাত্রাতিরিক্ত আকার নেয়নি। এমনকি সখি হওয়া সত্ত্বেও সুহাও ঊষার আচরণকে বরদাস্ত করেনি। সরাসরি বৃদ্ধ যোহনের সঙ্গে ঝগড়ায় মেতে উঠেছে। পায়ে পা দিয়ে সে ঝগড়া করেছে। তার আচরণে, কথাবার্তায় গ্রাম্যতার প্রকাশ ঘটেছে। এমনকি পিতার বিরুদ্ধেও সে সাবলীল। কোথাও সম্ভ্রমটুকুও ছিল না। লখাইয়ের প্রতি রুষ্ট হওয়ার জন্য এলোখোঁপা বেঁধে সে তার বাবাকে রূঢ়ভাষায় জানিয়েছে, ''খবরদার বলছি...খবরদার! মুখ আঁশটে করবে না..মরদ কত...ঐ ইষ্টুপিডকে বকতে পাচ্ছ না... একরত্তি ছেলেমানুষটার উবরি যত কেদ্‌দানি—।''

সবশেষে তাঁর উপন্যাসের শৈলীগত দিক নিয়ে কিছু কথা বলা আবশ্যক। উপন্যাসটির দৃঢ় সন্নিবদ্ধ কোথাও কোনো অনুচ্ছেদভাগ নেই। এমনকি, উক্তি-প্রত্যুক্তি পরিবেশনে লেখক কোথাও কোনো ফাঁক রাখেননি। সেকারণে উপন্যাস পাঠের আগে পাঠকের মনে হৃদকম্পন শুরু হতে বাধ্য। উপন্যাসটি বড়ো কড়া'পাকের। শুধু বর্তমান যুবসমাজই নয়, যে কোনো স্তরের পাঠকের কাছেই এর অর্থভেদ করা দুষ্কর। কোনো কোনো স্থানে পরপর একাধিক অব্যয়ের (যদ্যপি—তত্রাচ, উপরন্ত—অথচ) প্রয়োগে বাক্যের অর্থভেদ করা রীতিমতো কঠিন হয়ে উঠেছে। শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে লেখক কোনো বাছবিচার করেননি। তৎসম শব্দের পাশে দেশি বা চলিত শব্দ অনায়াস দক্ষতায় ব্যবহার করেছেন। সাধুরীতির ক্রিয়াপদের পাশে চলিত রীতির ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করেছেন।

কমলবাবুর উক্তিপ্রয়োগ জীবন্ত। আঞ্চলিকতা দোষ সেখানে অনায়াসে ফুটে উঠেছে। ''কি ধ্যানপানা হচ্ছে, আমার পিণ্ডি উচ্চুগ্য করছি'', 'মাইরি মায়ের দিব্যি তুমি ভার্‌রী সুন্দর'। 'এই

শুয়ার বামুনের ঔরসে নাব—এখানে বাক্যের মধ্যে একেবারে দেশজ ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সুহার উচ্চারণে, ''গাছতলা'—'গ্যাসতলা' হয়েছে। দেশজ উক্তি বা সংলাপ তাঁর বর্ণনা অংশের পাশে বড়োই বেমানান। উত্তম পুরুষে সাধারণ বর্তমানকালে—'লুম' প্রত্যয়ের প্রয়োগ ঘটেছে। বাগধারা প্রয়োগে অশালীন উক্তিপ্রয়োগে লেখক কোনো লাগাম রাখেননি। গানের বিশেষণ হিসেবে 'ম্যাদাটে' শব্দের প্রয়োগ গ্রাম্যতাকে তুলে ধরে। 'খারাপ' অর্থে 'নসরিয়া আদমি' শব্দবন্ধের প্রয়োগ করেছে সুহা। সুহাকে 'জেলাবী মেয়েছেলে' বলে গালি দিয়েছে যোহন একাদশী। বাপ-মা তুলে কথাবার্তা রুচিবিগর্হিত ঠিকই তবে লেখকের জটিল ভাষারীতির ফাঁকে কাহিনীকে অনেকখানি জীবন্ত আকার দিয়েছে।

বাক্যের অন্বয় কোথাও কোমল আবার কোথাও কঠিন। ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি কখনো কখনো শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছেন। কোনো কোনো জায়গায় যৌনতার আঁশটে গন্ধ ফুটে উঠেছে। ড্রয়িংরুম বিলাসী কৃত্রিম শব্দের পাশাপাশি। তিনি অনায়াস দক্ষতায় দেশজ স্ল্যাং প্রয়োগ করেছেন। ভাষাকে কখনো চূড়ায় তুলেছেন, আবার কখনো খাদে নামিয়ে এনেছেন। ভাষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেননি। উপন্যাসটির বর্ণনা অংশে লেখক ভাষাগত সাম্য বজায় রাখতে পারেননি। তাই পড়তে গিয়ে পাঠক মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। ভাষার উচ্চাবচ বা বন্ধুরতার কারণে পাঠককে এ উপন্যাস বারবার হোঁচট খেতে হয়। ভাববস্তুর মর্মভেদ তীব্র বাধার সৃষ্টি হয়।

বস্তুতপক্ষে বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে থেকে কমলকুমার যে সৌন্দর্য্যের অন্বেষণ করেছেন তা বাস্তবকে অতিক্রম করে অলৌকিকতার পথে ধাবিত হয়েছে। এই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছে বিলাস থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধ যোহন একাদশী পর্যন্ত। কাহিনীর গতি অত্যন্ত শ্লথ। বিলাসের দু'চোখে ছিল গ্রামীন সৌন্দর্য, শরীরে শবযাত্রার ক্লান্তি সত্ত্বেও তার চোখে ছিল গোলাপের আশ্চর্য মাখানো। তবে গ্রামীন সৌন্দর্য অনেক বেশি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'সুহাসিনীর পমেটম' উপন্যাসে কোনো নাগরিক বিলাসিতা এখানে প্রাধান্য পায়নি। শহুরে জীবনের গণ্ডি থেকে অনেকটাই দূরে বালক লখাই, কিংবা পোস্টমাস্টার অক্ষয়। নগ্নতার মধ্যেও এখানে লেখক অনাবিল সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন। তুলনায় 'গোলাপ সুন্দরী'-র মধ্যে কোথাও যেন নাগরিকতা কৃত্রিমতা ফুটে উঠেছে। বিলাসের জামাইবাবু মোহিতের কথার মধ্যে ইংরেজির প্রভাব বেশি। তার সৌখিন কথাবার্তা, আচরণের মধ্যে নাগরিক পালিশ আছে। বিলাস সেখান থেকে যেন অনেকটাই দূরে। যদিও এই উপন্যাসে প্রায় সত্তর বছরের গোলক মিত্তিরের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে, কিন্তু উপন্যাসের তুলনায় তাঁর বড়ো সংক্ষিপ্ত স্থান জুড়ে। বরং চেট্টির মুখে ফরাসি এপিটাপ শুনতে বড়ো বেশি দড় বিলাস।

কমলকুমারের চরিত্রেরা বিপদের মধ্যে বড়ো বেশি ঈশ্বরনির্ভর। বালক লখাই থেকে শুরু করে 'গোলাপ সুন্দরী' শিক্ষিত মোহিত পর্যন্ত। বিশ্বযুদ্ধ সমকালে নগরজীবনের ঘোর বিপন্নতার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস মানুষ হারিয়ে ফেলেছিল, চতুর্দিকে পরিকীর্ণ হয়ে উঠেছিল অজস্র মানুষের লাশ। সেখানে রোমান্টিক লেখকের মন দৈব নির্ভরতা থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেনি।

এই বিশ্বাস গ্রাম্য মানুষের মনে থেকে থাকতে পারে,'সুহাসিনীর পমেটম' উপন্যাসে গ্রামের মানুষ বারব্রত পালন করে। পঞ্চানন তলায় যায়। শৈবালীর ভর হয়। এসব সম্ভব। কিন্তু মোহিত কীভাবে বলতে পারে, ''আও গড্ অলমাইটি তোমার দিদি-ই গল্প করতে পারে।'' ডাক্তার রঙ্গস্বামীও বিলাসকে জানিয়েছেন, ''ভগবানকে বিশ্বাস করো''। সময়-সমাজ-পরিস্থিতিকে গল্পের মধ্যে লেখক আড়াল করেছেন। নিছক 'স্টোরি টেলার' হিসাবে কাহিনীকে উপন্যাসের মধ্যে প্রাধান্য দিয়েছেন, সাহিত্যিক জ্যঁর হিসেবে কোনো গভীর বক্তব্য আলোচ্য দু'খানি উপন্যাসে তেমন উঠে আসেনি। 'সুহাসিনীর পমেটম' উপন্যাসে ঔপনিবেশিক অত্যাচারের চেহারা দেখানোর অবকাশ থাকলেও লেখক তা দেখাননি। তবে আঞ্চলিক সংস্কৃতির চিত্র উদ্ধারে স্ল্যাং প্রয়োগের দক্ষতায় তাঁর উপন্যাস বাংলাসাহিত্যে প্রথম একটি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল।

তথ্যসূত্র :

১। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'আমার গদ্যসাহিত্য পাঠ', 'পরম্পরা প্রকাশন, ২০এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১১, পৃ.। ১৫৫।

২। 'উপন্যাস সমগ্র', 'কমলকুমার মজুমদার, আনন্দ পাবলিশার্স চতুর্থ মুদ্রণ ২০১১।

৩। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তদেব পৃ.। ১৫৪।